মুখবন্ধ

যে কোনো দেশে পূর্ণাঙ্গ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রথম সোপান হচ্ছে অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন। অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন প্রক্রিয়াকে এক কথায় 'নির্বাচনি গণতন্ত্র' বলা হয়ে থাকে, যার মাধ্যমে ভোটাররা তাঁদের প্রতিনিধি নির্বাচন করে দেশে সরকার প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করেন। বলা দরকার যে, নির্বাচনি গণতন্ত্র কিন্তু কোনো বিশ্লেষণেই পূর্ণাঙ্গ গণতন্ত্র নয়, যদিও আমাদের দেশে এটিকেই পূর্ণাঙ্গ গণতন্ত্র হিসেবে ব্যবহারের চেষ্টা করা হয়।

নির্বাচনি গণতন্ত্রের ধারণাটি মূলত পশ্চিমা ধ্যান-ধারণা থেকে উদ্ভূত; আন্তর্জাতিক এনজিও এবং নাগরিক সংগঠনসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এটি আমাদের দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এতে প্রতিটি যোগ্য নাগরিকের ভোটার ও প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশগ্রহণের অধিকার প্রয়োগ, নিয়মিত ও পর্যায়ক্রমিক নির্বাচন অনুষ্ঠান, নির্বাচন পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানের সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা ইত্যাদি বিষয় গুরুত্ব পেয়েছে। কিন্তু পাশ্চাত্যের পণ্ডিতেরা সরকারকাঠামোকে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের উপাদান হিসেবে উল্লেখ করেননি। কারণ, পাশ্চাত্যে সরকারকাঠামো কোনো বিতর্কের বিষয় নয়; দেশে সংবিধান অনুযায়ী যে কাঠামো বিদ্যমান, সেটির অধীনেই নির্বাচন সবার কাছে গ্রহণযোগ্য।

আমাদের দেশে নির্বাচনকালীন সরকার পদ্ধতির রূপরেখা নিয়ে একটি তীব্র বিতর্ক রয়েছে; যদিও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পরিবর্তে দলীয় সরকারের অধীন বাংলাদেশে যতগুলো নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে তার কোনোটাই সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য হয়নি। তবে আমি সে বিতর্কে না গিয়ে দলীয় সরকার কিংবা অন্য যে কোনো ব্যবস্থায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য কী কী বিষয় নিশ্চিত করা প্রয়োজন, সে সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতার আলোকে কিছু কথা বলতে চাই।

সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনি ব্যবস্থার মূল ভিত্তি একটি দক্ষ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশন। সাম্প্রতিককালে নির্বাচন কমিশনের স্বাধীনতা বৃদ্ধির পক্ষে সরকারের তরফ থেকে প্রায়ই জোরালো বক্তব্য শোনা গেছে। তবে স্বাধীনতা বলতে তারা কী বোঝাতে চান, তার কোনো সুস্পষ্ট রূপরেখা কিংবা ব্যাখ্যা কারও কাছ থেকে পাওয়া যায়নি। কমিশনের স্বাধীনতা বৃদ্ধির নামে ২০০৮ সালে নতুন নির্বাচন কমিশন গঠনের আগে ক্ষমতাসীন সরকার যে কাজটি করেছে তা হলো, কমিশনারদের সংখ্যা তিন থেকে পাঁচে বৃদ্ধি করে সংবিধানে সংশ্লিষ্ট ধারাটির সংশোধন। অথচ আমাদের কমিশন এবং সংবিধান সংশোধনের লক্ষ্যে বেগম সাজেদা চৌধুরীর নেতৃত্বে গঠিত সংশ্লিষ্ট সংসদীয় স্থায়ী কমিটি কমিশনারের সংখ্যা তিনজনে সীমাবদ্ধ রাখার পক্ষেই তাদের দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করেছিল। এই সংখ্যা বৃদ্ধিতে কমিশনের তো কোনো উপকারই হয়নি, বরং প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সমন্বয়ে দীর্ঘসূত্রতা ও অনাকাঙ্ক্ষিত জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে বলে বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে।

অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য কমিশনের পূর্ণ স্বাধীনতা নিশ্চিত করা এবং স্বচ্ছতা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে স্বাধীনচেতা ব্যক্তিদের নিয়োগ দেওয়া অবশ্যই সঠিক পদক্ষেপ। কিন্তু স্বাধীনতার বিভিন্ন উপাদান বিশ্লেষণ করে যেসব ক্ষেত্রে ঘাটতি কিংবা দুর্বলতা আছে, সেসব প্রশমনের জন্য ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ না করে শুধু বক্তব্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে তা অন্তঃসারশূন্য রাজনৈতিক বক্তব্যেই পর্যবসিত হয়।

কমিশনের স্বাধীনতা দুই ধরনের স্বতন্ত্র অথচ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত উপাদানের সার্থক সমন্বয়ের মধ্যে নিহিত। প্রথম উপাদানটি কাঠামোগত, যার সহায়তায় কমিশন প্রশাসন, প্রযুক্তি, আইনি কাঠামো ও আর্থিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে তার ওপর বিভিন্ন আইনের মাধ্যমে অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের সক্ষমতা অর্জন করে। এই উপাদানকে সামগ্রিকভাবে কাঠামোগত স্বাধীনতা বলা যেতে পারে। স্বাধীনতার অপর উপাদানটি আচরণগত, যার প্রভাবে কমিশনাররা একক কিংবা সমষ্টিগতভাবে সব ভয়-ভীতি কিংবা রাগ-অনুরাগের ঊর্ধ্বে থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণে এবং তা বাস্তবায়নে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকেন। স্বাধীনতার এই উপাদানকে আচরণগত স্বাধীনতা হিসেবে আখ্যায়িত করা যেতে পারে।

আমার অভিজ্ঞতায় আমি যতদূর দেখেছি, কাঠামোগত স্বাধীনতার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন এখন যথেষ্ট ক্ষমতাবান ও শক্তিশালী। নির্বাচন প্রক্রিয়ার 'তত্ত্বাবধায়ন, নির্দেশনা ও নিয়ন্ত্রণ' বিষয়ে সংবিধানে কমিশনকে ব্যাপক ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। ভারতীয় সংবিধানে এই একই ধরনের একটি বিধান আছে এবং সেই সূত্রে ভারতীয় সুপ্রিম কোর্ট এই মর্মে অসংখ্য নির্দেশনা জারি করেছে

যে, সংবিধানের বিধানাবলি পরিপালন সাপেক্ষে ভারতীয় নির্বাচন কমিশন নির্বাচন পরিচালনার জন্য যে কোনো ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণে পূর্ণ ক্ষমতাবান। বিশেষ করে ভারতীয় সুপ্রিম কোর্টের একাধিক রায়ে এই মর্মে সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়েছে যে, নির্বাচন পরিচালনাকালে কোনো বিশেষ পরিস্থিতি মোকাবিলায় যদি বিদ্যমান আইনে কোনো বিধান না থাকে, কিংবা বিধান যদি অপ্রতুল প্রতীয়মান হয়, তবে সে ক্ষেত্রে সংবিধানের অধীন প্রাপ্ত অন্তর্নিহিত ক্ষমতা অনুযায়ী কমিশন প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে। বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের সংবিধানের ১১৯ অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে, এমনকি আইনি বিধানের সঙ্গে সংযোজন করার যে ক্ষমতা সাধারণত নির্বাচিত সংসদের জন্য নির্ধারিত, 'ইনহেরেন্ট' বা অন্তর্নিহিত ক্ষমতা হিসেবে তা ব্যবহারের ক্ষমতা কমিশনের রয়েছে (*আলতাফ হোসেন বনাম আবুল কাশেম, ৪৫ ডিএলআর*)।

বাংলাদেশে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে *গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ* ১৯৭২ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রধান আইন। ২০০৮ সালে বিভিন্ন নাগরিক সমাজ, গণমাধ্যমের প্রতিনিধি ও রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে একাধিকবার আলোচনার পর নির্বাচনে প্রার্থী নির্বাচন, নির্বাচনি প্রচারণা, নির্বাচনি ব্যয়, ভোট প্রদান পদ্ধতি, নির্বাচনি বিবাদ নিষ্পত্তি এবং রাজনৈতিক দলগুলোর নিবন্ধনের ক্ষেত্রে বিরাজমান আইনের দুর্বলতাগুলো চিহ্নিত করে পদ্ধতি উন্নয়নের লক্ষ্যে ব্যাপক আকারে সংশোধনীসমূহ কার্যকর করা হয়েছে। একক সংশোধনীর মাধ্যমে এত মৌলিক, বহুমুখী ও ব্যাপক সংস্কার বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশনের ইতিহাসে এই প্রথম।

২০০৮ সালে নির্বাচন কমিশন সচিবালয় অধ্যাদেশ জারির পর কমিশনের স্বাধীনতার বিষয়টি এই প্রথমবারের মতো একটি প্রাতিষ্ঠানিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়। কমিশন সচিবালয়কে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে বিযুক্ত করে এটিকে একটি সম্পূর্ণ স্বাধীন সত্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। নিজস্ব সাংগঠনিক কাঠামো নির্ধারণ, জনবল নিয়োগ ও অর্থ ছাড়করণের ক্ষেত্রে কমিশনকে এমন ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে, যেন এসব প্রক্রিয়ায় কমিশনকে বারবার সরকারের দ্বারস্থ হতে না হয়।

দুঃখের বিষয়, দীর্ঘকাল ধরে লালিত আমলাতান্ত্রিক সংস্কৃতির ঊর্ধ্বে উঠে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ এই লক্ষ্যের বাস্তবায়নে আদৌ তৎপর নন। সংস্থাপন ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের নিম্ন ও মধ্যম পর্যায়ের আমলারা অন্যান্য মন্ত্রণালয় কিংবা সংস্থা থেকে পাওয়া প্রস্তাবগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষায় এত অভ্যস্ত যে তাদের নিরীক্ষা ছাড়া ব্যতিক্রমী পদ্ধতিতে কোনো আদেশ জারি করার মানসিকতা তাদের নেই। তাদের মানসিকতার পরিবর্তন হলেই তারা সচিবালয় আইনের মর্মার্থ অনুধাবন করতে পারবেন এবং কমিশনের কাঠামোগত স্বাধীনতার পক্ষে একটা বিরাট বাধা অপসারিত হবে।

অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য কমিশনের কাঠামোগত স্বাধীনতার প্রয়োজন, কিন্তু এটি যথেষ্ট নয়। দেশের বিভাজিত রাজনীতির প্রেক্ষাপটে আইনের ভিত্তিতে সর্বজনশ্রদ্ধেয়, অভিজ্ঞ ও দক্ষ ব্যক্তিদের সমন্বয়ে কমিশন গঠিত হওয়া প্রয়োজন, যাঁরা সবার কাছে গ্রহণযোগ্য হবেন। কমিশনাররা সরকারি পর্যায়ে অনেক উচ্চ পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত; ওয়ারেন্ট অব প্রিসিডেন্সে তাঁদের অবস্থান প্রতিমন্ত্রীদের সমতুল্য। বেতন-ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য কমিশনার যথাক্রমে আপিল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগের বিচারকদের মতোই এসব সুবিধা ভোগ করে থাকেন। এই কারণে সরকারের সচিব কিংবা হাইকোর্টের বিচারপতি পদমর্যাদার নিচে কোনো ব্যক্তিকে কমিশনার হিসেবে নিয়োগের জন্য বিবেচনা করা সমীচীন নয়। স্বাধীনতার পর থেকে ভারতে কখনোই সচিব পদমর্যাদার নিচে কাউকে কমিশনার পদে নিয়োগ দেওয়া হয়নি। পাকিস্তানেও শুধু সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিরাই কমিশনারদের পদ অলংকৃত করেছেন। এখানে আরও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, কমিশন সচিবালয় একজন সচিবের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। সে অবস্থায় তার নিচের পদমর্যাদার কেউ তার ওপর সমাসীন হলে সচিবালয়-কমিশন সম্পর্কেও নানা ধরনের বাড়তি ঝামেলার সৃষ্টি হয়।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য কমিশনার নির্বাচনের ক্ষেত্রে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনার বিষয় হলো সম্ভাব্য কমিশনারদের অতীত সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য উদ্‌ঘাটন। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ না করলেই নয়, ১৯৭২ সালে প্রণীত আমাদের সংবিধানে কমিশনারদের নিয়োগের জন্য আইন প্রণয়নের বিধান করা হলেও স্বাধীনতার প্রায় অর্ধশতক পরও এ ধরনের কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। আমাদের কমিশন উদ্যোগী হয়ে কমিশনারদের নিয়োগ বিবেচনাকালে যোগ্যতা-অযোগ্যতার কিছু মানদণ্ড নির্ধারণ করে একটি আইনের খসড়া সরকারের বিবেচনার জন্য পেশ করেছিল। সেই খসড়ায় আরও প্রস্তাব করা হয়েছিল যে, নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগ যেন সব দলের সঙ্গে পরামর্শক্রমে সম্পন্ন করা হয়। সে লক্ষ্যে বিভিন্ন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের সমন্বয়ে একটি সার্চ কমিটি গঠন করে তাদের সুপারিশ জাতীয় সংসদের কার্য উপদেষ্টা কমিটির বিবেচনা ও অনুমোদনেরও প্রস্তাব করা হয়েছিল। প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ প্রক্রিয়াটি স্বচ্ছ হওয়াও আবশ্যক।

অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য অন্য দুটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো নির্বাচনি প্রচার-প্রচারণার ক্ষেত্রে সবার জন্য সমতার নীতি আর ভোটারদের অবাধে ভোট প্রদানের নিশ্চয়তার বিধান। আমাদের সময়ে বিভিন্ন নির্বাচন পরিচালনা করে আমি সবার কাছে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রক্রিয়ার বিষয়ে দুটি মূল প্রস্তাবনায় উপনীত হয়েছি, যার ভিত্তিতে নির্বাচন পরিচালনা পদ্ধতি নির্ধারণ করা সংগত হবে:

১. যে ধরনের সরকার কাঠামোই থাকুক না কেন, নির্বাচনি প্রক্রিয়াকে নানাভাবে ব্যাহত করে যে কোনোভাবে জয়ী হওয়ার জন্য রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীরা চেষ্টা চালান।

২. নির্বাচন কমিশন নিজস্ব কর্মকর্তা সহযোগে সরেজমিনে নির্বাচন প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করে (১)-এ বর্ণিত প্রবণতা নিয়ন্ত্রণে সক্ষম।

উপরিউক্ত দুই প্রস্তাবের ভিত্তিতে নির্বাচন পরিচালনা করতে হলে নির্বাচনের সময় কমিশনের নিয়ন্ত্রণ যত নিরঙ্কুশ হবে, কমিশনের কার্যকারিতা তত বৃদ্ধি পাবে। বিশেষ করে, যদি নির্বাচন কমিশন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সেনাবাহিনী ব্যবহার না করার সিদ্ধান্ত নেয়, তবে একই দিনে সারা দেশে নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রচেষ্টা অনেক ক্ষেত্রেই নির্বাচনি আইন লঙ্ঘন কিংবা সহিংসতার মুখে বিপন্ন হতে পারে। অর্থাৎ আমি মনে করি, নির্বাচন কমিশন ও রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে আস্থার সংকট থাকায় জাতীয় নির্বাচন একদিনে হওয়া এবং নির্বাচনের আগে-পরে সেনাবাহিনী মোতায়েন করা অত্যাবশ্যক। তবে আমাদের কমিশনের অভিজ্ঞতার আলোকে আমি মনে করি, উপজেলা, পৌরসভা কিংবা ইউনিয়ন পরিষদ- এসবের কোনো নির্বাচনই একই দিনে অনুষ্ঠান থেকে বিরত থাকা কমিশনের জন্য প্রশাসনিকভাবে যেমন সুবিধাজনক, তেমনি ভোটারদের ভোট প্রদানের জন্যও নিরাপদ। অর্থাৎ অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের স্বার্থে এসব নির্বাচন (জাতীয় নির্বাচন ছাড়া) পর্যায়ক্রমিক বা স্টেগার্ড হওয়াটাই বাঞ্ছনীয়।

প্রভাবশালী প্রার্থীরা, বিশেষ করে সরকারদলীয় প্রার্থীরা, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কর্মসূচির মাধ্যমে সমতার নীতি ব্যাহত করার চেষ্টা চালান। আর মাঠ পর্যায়ের প্রশাসনকে স্তরে স্তরে নিজেদের আস্থাভাজন কর্মকর্তাদের দিয়ে সাজানোর ইতিহাস তো আমরা জানি। প্রশাসনের অনাকাঙ্ক্ষিত দলীয়করণ সব সময়ই গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানে বিরাট বাধা, বর্তমানে যা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। আমি অবশ্য ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করি যে, হাতে গোনা কতিপয় অঙ্গসংগঠনের ক্যাডার, যাঁরা পরবর্তীকালে বিসিএস ক্যাডারে চাকরিপ্রাপ্ত হয়েছেন, তাঁরা বাদে বাকি সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী নিরপেক্ষতার সঙ্গে তাঁদের দায়িত্ব পালন করতে চান। অনেক সময়ই ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাধ্য হয়ে তাঁদের অনেক অপকর্মে লিপ্ত হতে হয়। নির্বাচনের সময় নির্বাচনসংক্রান্ত সব বিষয়ে এবং নির্বাচনে প্রভাব ফেলতে পারে বিদ্যমান সরকারের এমন সব সিদ্ধান্তের ওপর নির্বাচন কমিশনের নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণ এ সমস্যা উত্তরণে ভূমিকা রাখতে পারে।

সুষ্ঠু নির্বাচনের ক্ষেত্রে আদালতের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অতীতে নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত, বিশেষত প্রার্থীর মনোনয়নপত্র গ্রহণের ক্ষেত্রে আদালত হস্তক্ষেপ করেনি। কিন্তু সাম্প্রতিককালে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এর ব্যতয়ে দেখা গেছে এবং অনেক ক্ষেত্রে সংবিধান লঙ্ঘন করেই। আমাদের সুপারিশে সংবিধানে ১২৫(গ) অনুচ্ছেদ সংযোজন হয়েছে, যাতে বলা হয়েছে, 'কোন আদালত, নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হইয়াছে এইরূপ কোন নির্বাচনের বিষয়ে, নির্বাচন কমিশনকে যুক্তিসংগত নোটিশ ও শুনানির সুযোগ প্রদান না করিয়া, অন্তর্বর্তী বা অন্য কোনরূপে কোন আদেশ বা নির্দেশ প্রদান করিবেন না।' দুঃখজনক হলেও সত্য যে, সাম্প্রতিক নির্বাচনগুলোয় এ ধরনের ঘটনা ঘটতে দেখা গেছে।

সবশেষে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার অবারিত হতে হবে। সনাতন পদ্ধতিতে সিল-ছাপ্পর দিয়ে ভোট প্রদানের পদ্ধতি অনেক অনাচারের সৃষ্টি করেছে। এসব খুঁটিনাটি সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য আমরা ইভিএম প্রযুক্তি ব্যবহারের উদ্যোগ নিই। তবে ইভিএম ব্যবহারের ক্ষেত্রে দুটি বিষয় বিবেচনায় নেওয়া দরকার বলে আমি মনে করি; এর একটি হলো ইভিএমের নিরাপত্তা, আরেকটি হলো রাজনৈতিক ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা। একইভাবে সীমানা পুনর্নির্ধারণে আমরা জিআইএস প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রয়োজনীয় পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছিলাম। ভবিষ্যতে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী মোতায়েনের ক্ষেত্রেও জিআইএস অবদান রাখতে পারে। আর ছবিসহ ভোটার তালিকা ও জাতীয় পরিচয়পত্র প্রণয়নের প্রযুক্তি এখন কমিশনের রুটিন কাজের মতো দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের অফিস পর্যন্ত ব্যাপৃত হয়েছে।

১৯৯১ সালে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর দেশে যতগুলো জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে, দেখা গেছে পরাজিত দল ও প্রার্থীরা সব কটি নির্বাচনের ফলাফলই প্রত্যাখ্যান করেছে। এই ধরনের হতাশাব্যঞ্জক অভিজ্ঞতার আলোকে নির্বাচন কমিশনের কাঠামোগত ও আচরণগত স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করা হলেও এবং সাধ্যাতীত ভালো নির্বাচন অনুষ্ঠান করা গেলেও সব রাজনৈতিক দল তা নির্দ্বিধায় মেনে নেবে কি না, তা নিয়ে আমার সন্দেহ আছে। এজন্য যে উদার মন ও মানসিকতার প্রয়োজন তা আমাদের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে নেই। সে কারণেই শুধু নির্বাচন কমিশনকে স্বাধীনতা প্রদান করলেই তা যথেষ্ট হবে না। অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের সবচেয়ে বড় স্টেকহোল্ডার রাজনৈতিক দলের সহযোগিতা ও দায়িত্বশীলতারও প্রয়োজন হবে। আরও প্রয়োজন হবে নাগরিকদের, বিশেষ করে নাগরিক সমাজের, সোচ্চার ভূমিকা ও সক্রিয় সহযোগিতা। কারণ, নির্বাচন অনুষ্ঠান বহুবিধ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সম্মিলিত প্রয়াস।

এই মুখবন্ধের শুরুতে বলা হয়েছে যে, নির্বাচনি গণতন্ত্রের ধারণাটি আন্তর্জাতিক এনজিও এবং নাগরিক সংগঠনসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আমাদের দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর এক্ষেত্রে, বিশেষ করে ভোটারদের ক্ষমতায়িত করে বাংলাদেশের নির্বাচনি প্রক্রিয়াকে পরিচ্ছন্ন করার ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান অনুঘটকের ভূমিকা পালন করেছে নাগরিক সংগঠন 'সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক'।

আমি যতদূর জানি, সুজন তার প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থী নির্বাচনের লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এক্ষেত্রে সুজন-এর উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশের নির্বাচনি সংস্কৃতিতে ইতিবাচক গুণগত পরিবর্তন আনা। এ লক্ষ্যে সুজন নাগরিকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা; নাগরিক সংলাপ; মনোনয়নপত্রের সাথে প্রার্থী প্রদত্ত তথ্য একত্রীকরণ ও তুলনামূলক চিত্র তৈরি করে

২. নির্বাচন কমিশন নিজস্ব কর্মকর্তা সহযোগে সরেজমিনে নির্বাচন প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করে (১)-এ বর্ণিত প্রবণতা নিয়ন্ত্রণে সক্ষম।

উপরিউক্ত দুই প্রস্তাবের ভিত্তিতে নির্বাচন পরিচালনা করতে হলে নির্বাচনের সময় কমিশনের নিয়ন্ত্রণ যত নিরঙ্কুশ হবে, কমিশনের কার্যকারিতা তত বৃদ্ধি পাবে। বিশেষ করে, যদি নির্বাচন কমিশন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সেনাবাহিনী ব্যবহার না করার সিদ্ধান্ত নেয়, তবে একই দিনে সারা দেশে নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রচেষ্টা অনেক ক্ষেত্রেই নির্বাচনি আইন লঙ্ঘন কিংবা সহিংসতার মুখে বিপন্ন হতে পারে। অর্থাৎ আমি মনে করি, নির্বাচন কমিশন ও রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে আস্থার সংকট থাকায় জাতীয় নির্বাচন একদিনে হওয়া এবং নির্বাচনের আগে-পরে সেনাবাহিনী মোতায়েন করা অত্যাবশ্যক। তবে আমাদের কমিশনের অভিজ্ঞতার আলোকে আমি মনে করি, উপজেলা, পৌরসভা কিংবা ইউনিয়ন পরিষদ- এসবের কোনো নির্বাচনই একই দিনে অনুষ্ঠান থেকে বিরত থাকা কমিশনের জন্য প্রশাসনিকভাবে যেমন সুবিধাজনক, তেমনি ভোটারদের ভোট প্রদানের জন্যও নিরাপদ। অর্থাৎ অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের স্বার্থে এসব নির্বাচন (জাতীয় নির্বাচন ছাড়া) পর্যায়ক্রমিক বা স্টেগার্ড হওয়াটাই বাঞ্ছনীয়।

প্রভাবশালী প্রার্থীরা, বিশেষ করে সরকারদলীয় প্রার্থীরা, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কর্মসূচির মাধ্যমে সমতার নীতি ব্যাহত করার চেষ্টা চালান। আর মাঠ পর্যায়ের প্রশাসনকে স্তরে স্তরে নিজেদের আস্থাভাজন কর্মকর্তাদের দিয়ে সাজানোর ইতিহাস তো আমরা জানি। প্রশাসনের অনাকাঙ্ক্ষিত দলীয়করণ সব সময়ই গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানে বিরাট বাধা, বর্তমানে যা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। আমি অবশ্য ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করি যে, হাতে গোনা কতিপয় অঙ্গসংগঠনের ক্যাডার, যাঁরা পরবর্তীকালে বিসিএস ক্যাডারে চাকরিপ্রাপ্ত হয়েছেন, তাঁরা বাদে বাকি সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী নিরপেক্ষতার সঙ্গে তাঁদের দায়িত্ব পালন করতে চান। অনেক সময়ই ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাধ্য হয়ে তাঁদের অনেক অপকর্মে লিপ্ত হতে হয়। নির্বাচনের সময় নির্বাচনসংক্রান্ত সব বিষয়ে এবং নির্বাচনে প্রভাব ফেলতে পারে বিদ্যমান সরকারের এমন সব সিদ্ধান্তের ওপর নির্বাচন কমিশনের নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণ এ সমস্যা উত্তরণে ভূমিকা রাখতে পারে।

সুষ্ঠু নির্বাচনের ক্ষেত্রে আদালতের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অতীতে নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত, বিশেষত প্রার্থীর মনোনয়নপত্র গ্রহণের ক্ষেত্রে আদালত হস্তক্ষেপ করেনি। কিন্তু সাম্প্রতিককালে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এর ব্যতয়ে দেখা গেছে এবং অনেক ক্ষেত্রে সংবিধান লঙ্ঘন করেই। আমাদের সুপারিশে সংবিধানে ১২৫(গ) অনুচ্ছেদ সংযোজন হয়েছে, যাতে বলা হয়েছে, 'কোন আদালত, নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হইয়াছে এইরূপ কোন নির্বাচনের বিষয়ে, নির্বাচন কমিশনকে যুক্তিসংগত নোটিশ ও শুনানির সুযোগ প্রদান না করিয়া, অন্তর্বর্তী বা অন্য কোনরূপে কোন আদেশ বা নির্দেশ প্রদান করিবেন না।' দুঃখজনক হলেও সত্য যে, সাম্প্রতিক নির্বাচনগুলোয় এ ধরনের ঘটনা ঘটতে দেখা গেছে।

সবশেষে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার অবারিত হতে হবে। সনাতন পদ্ধতিতে সিল-ছাপ্পর দিয়ে ভোট প্রদানের পদ্ধতি অনেক অনাচারের সৃষ্টি করেছে। এসব খুঁটিনাটি সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য আমরা ইভিএম প্রযুক্তি ব্যবহারের উদ্যোগ নিই। তবে ইভিএম ব্যবহারের ক্ষেত্রে দুটি বিষয় বিবেচনায় নেওয়া দরকার বলে আমি মনে করি; এর একটি হলো ইভিএমের নিরাপত্তা, আরেকটি হলো রাজনৈতিক ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা। একইভাবে সীমানা পুনর্নির্ধারণে আমরা জিআইএস প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রয়োজনীয় পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছিলাম। ভবিষ্যতে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী মোতায়েনের ক্ষেত্রেও জিআইএস অবদান রাখতে পারে। আর ছবিসহ ভোটার তালিকা ও জাতীয় পরিচয়পত্র প্রণয়নের প্রযুক্তি এখন কমিশনের রুটিন কাজের মতো দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের অফিস পর্যন্ত ব্যাপৃত হয়েছে।

১৯৯১ সালে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর দেশে যতগুলো জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে, দেখা গেছে পরাজিত দল ও প্রার্থীরা সব কটি নির্বাচনের ফলাফলই প্রত্যাখ্যান করেছে। এই ধরনের হতাশাব্যঞ্জক অভিজ্ঞতার আলোকে নির্বাচন কমিশনের কাঠামোগত ও আচরণগত স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করা হলেও এবং সাধ্যাতীত ভালো নির্বাচন অনুষ্ঠান করা গেলেও সব রাজনৈতিক দল তা নির্দ্বিধায় মেনে নেবে কি না, তা নিয়ে আমার সন্দেহ আছে। এজন্য যে উদার মন ও মানসিকতার প্রয়োজন তা আমাদের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে নেই। সে কারণেই শুধু নির্বাচন কমিশনকে স্বাধীনতা প্রদান করলেই তা যথেষ্ট হবে না। অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের সবচেয়ে বড় স্টেকহোল্ডার রাজনৈতিক দলের সহযোগিতা ও দায়িত্বশীলতারও প্রয়োজন হবে। আরও প্রয়োজন হবে নাগরিকদের, বিশেষ করে নাগরিক সমাজের, সোচ্চার ভূমিকা ও সক্রিয় সহযোগিতা। কারণ, নির্বাচন অনুষ্ঠান বহুবিধ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সম্মিলিত প্রয়াস।

এই মুখবন্ধের শুরুতে বলা হয়েছে যে, নির্বাচনি গণতন্ত্রের ধারণাটি আন্তর্জাতিক এনজিও এবং নাগরিক সংগঠনসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আমাদের দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর এক্ষেত্রে, বিশেষ করে ভোটারদের ক্ষমতায়িত করে বাংলাদেশের নির্বাচনি প্রক্রিয়াকে পরিচ্ছন্ন করার ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান অনুঘটকের ভূমিকা পালন করেছে নাগরিক সংগঠন 'সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক'।

আমি যতদূর জানি, সুজন তার প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থী নির্বাচনের লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এক্ষেত্রে সুজন-এর উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশের নির্বাচনি সংস্কৃতিতে ইতিবাচক গুণগত পরিবর্তন আনা। এ লক্ষ্যে সুজন নাগরিকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা; নাগরিক সংলাপ; মনোনয়নপত্রের সাথে প্রার্থী প্রদত্ত তথ্য একত্রীকরণ ও তুলনামূলক চিত্র তৈরি করে

ভোটারদের মাঝে বিতরণ; প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণকে এক মঞ্চে এনে 'জনগণের মুখোমুখি' করা; 'জনগণের মুখোমুখি' অনুষ্ঠানে প্রার্থীদের অঙ্গীকার ও ভোটারদের শপথ গ্রহণ; অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের দাবিতে সংবাদ সম্মেলন, সৎ-যোগ্য প্রার্থীদের নির্বাচিত করার আহ্বানে পোস্টারিং ও লিফলেটিং; সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থী নির্বাচনের আহ্বানে মানববন্ধন ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

নির্বাচন কমিশনে থাকাকালে আমরা সুজন-এর পক্ষ থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ পেয়েছি। সে সময় বিভিন্ন সংস্কার ভাবনা নির্বাচনি আইনে প্রতিফলন ঘটানোর লক্ষ্যে সুজন 'গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ-১৯৭২'-এর একটি সংশোধিত খসড়া অধ্যাদেশ আকারে নির্বাচন কমিশনকে প্রদান করে। এছাড়া 'নাগরিক কমিটি'সহ বহু ব্যক্তি সংগঠন থেকেও আমরা প্রস্তাব পাই। সুজনসহ বিভিন্ন ব্যক্তি, সংগঠন ও রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে উত্থাপিত প্রস্তাবের আলোকেই আমরা সংস্কার প্রস্তাব প্রণয়ন করি এবং 'গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ' ও আচরণবিধি সংশোধন করি।

এছাড়া ২০০৭ সালে সুজন একটি জরিপের মাধ্যমে ভোটার তালিকায় বিরাজমান সমস্যা তুলে আনে। পরবর্তী সময়ে এ নিয়ে হাইকোর্টে মামলা হলে সুজন-এর পক্ষ থেকে ভোটার ডেটাবেজ আদালতে উপস্থাপন করা হয়। এছাড়াও আমাদের সময়ে ছবিযুক্ত ভোটার তালিকার একটি ডামি তৈরি করে সুজন-এর পক্ষ থেকে দেখানো হয় যে, ছবিযুক্ত ভোটার তালিকা সহজেই প্রণয়ন করা সম্ভব। পরবর্তী সময়ে আমরা (নির্বাচন কমিশন) সেনাবাহিনীর সহায়তায় সফলভাবে ছবিযুক্ত ভোটার তালিকা প্রণয়ন করতে সক্ষম হই।

হলফনামার মাধ্যমে প্রার্থীদের সম্পর্কে তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও সুজন ভূমিকা পালন করে। জনস্বার্থে একটি মামলা দায়েরের পর হাইকোর্ট কর্তৃক ২০০৫ সালে নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের তথ্য বাধ্যতামূলকভাবে মনোনয়নপত্রের দাখিলের রায় প্রদান করা হলে বিভিন্ন নির্বাচনে সুজন-এর পক্ষ থেকে এই নির্দেশনা বাস্তবায়ন শুরু করা হয়। পরবর্তী সময়ে একটি স্বার্থান্বেষী মহল কর্তৃক এই রায়কে ভন্ডুল করার লক্ষ্যে ২০০৭ সালে জালিয়াতির মাধ্যমে আবু সাফা নামক জনৈক ব্যক্তিকে (যাকে আদালতে হাজির করা সম্ভব হয়নি) দিয়ে আপিল করানো হলেও সুজন-এর সর্বাত্মক প্রচেষ্টা ও আইনি পদক্ষেপে সুপ্রিম কোর্টে তা প্রতিহত করা সম্ভব হয়। বর্তমানে হলফনামার বিষয়টি ব্যাপকভাবে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। সুজনসহ বিভিন্ন সংগঠন হলফনামা বিশ্লেষণ ও প্রকাশ এবং গণমাধ্যম হলফনামাকে ভিত্তি করে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশ করছে। আমি জেনে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি যে, সুজন একটি সমৃদ্ধ ওয়েবসাইটের মাধ্যমে হলফনামার তথ্য ও তুলনামূলক বিশ্লেষণ সংরক্ষণ ও প্রকাশ করছে।

প্রার্থী কর্তৃক হলফনামায় তথ্য প্রদান ও তা ভোটারদের সামনে প্রকাশের মাধ্যমে ভোটাররা প্রার্থীদের সম্পর্কে জানার সুযোগ পান এবং তারা জেনে-শুনে-বুঝে নির্বাচনের দিন সুচিন্তিতভাবে সঠিক ব্যক্তিকে ভোট দিতে পারেন। আর ভোটাররা সঠিক প্রার্থীকে ভোট দিলেই সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীদের বিজয়ী হয়ে আসার পথ অবারিত হবে, আমাদের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের গুণগত মানে পরিবর্তন আসবে, দুর্নীতিবাজ ও দুর্বৃত্তরা নির্বাচনি অঙ্গন থেকে বিতাড়িত হবে। এর ফলে রাষ্ট্রের সব স্তরে গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হবে। তবে নাগরিকের তথ্য প্রাপ্তির অধিকারকে একটি সর্বব্যাপী আন্দোলনে পরিণত করতে হলে সুজন-এর পাশাপাশি আরও অনেককে এগিয়ে আসতে হবে। প্রার্থী প্রদত্ত হলফনামার তথ্য সংগ্রহ, তথ্যের বিশ্লেষণ এবং এগুলো ভোটারদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য এগিয়ে আসতে হবে অনেক সংগঠনকে। আরও এগিয়ে আসতে হবে সমাজসচেতন ও চিন্তাশীল নাগরিকদের।

নির্বাচনে প্রার্থীদের সম্পর্কে তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার আন্দোলনের কিছু সুফল ইতোমধ্যে আমরা পেতে শুরু করেছি। ভোটারদের সচেতনতার ফলে সুজন-এর ব্যানারে যে নাগরিক সক্রিয়তা সৃষ্টি হয়েছে, তা বেশ কিছু বিতর্কিত ব্যক্তিকে নির্বাচনি প্রক্রিয়া থেকে দূরে থাকতে সহায়তা করেছে। এছাড়া তথ্য গোপন ও অসত্য তথ্য প্রদানের অভিযোগে কিছু প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়েছে। বিশেষ করে আমরা দেখেছি দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর হলফনামা ও আয়কর বিবরণীর তথ্য অনুসন্ধান করে সাবেক সাত মন্ত্রী-এমপির দুর্নীতির খোঁজে নামে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। তাদের মধ্যে মহাজোট সরকারের তিনজন মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীও ছিলেন। যদিও দুদক পরবর্তী সময়ে উপরোক্ত সাত ব্যক্তিকেই দায়মুক্তি দেয় এবং দায়মুক্তি দেওয়ায় দুদক বেশ সমালোচনার মুখে পড়ে। আমি মনে করি, মনোনয়নপত্র বাছাই এবং নির্বাচন-পরবর্তীকালে তথ্য যাচাই-বাছাইয়ের ব্যাপারে ভবিষ্যতে আরও কঠোরতা অবলম্বন করলে এই সফলতা আরও বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে। নির্বাচন কমিশন হলফনামায় প্রদত্ত তথ্যের সঠিকতা যাচাই-বাছাই করার উদ্যোগ নিলে আমাদের নির্বাচনি প্রক্রিয়া অনেকটাই পরিচ্ছন্ন হতে পারে। কমিশন এক্ষেত্রে প্রয়োজনে দুর্নীতি দমন কমিশন ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সহায়তা নিতে পারে।

এটি অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে, দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের হলফনামায় প্রদত্ত তথ্যের বিশ্লেষণ এবং প্রার্থীদের মধ্যে যাঁরা ২০০৮ সালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন তাঁদের তথ্যের তুলনামূলক বিশ্লেষণ নিয়ে সুজন-এর উদ্যোগে একটি বই প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। এর আগে সুজন-এর উদ্যোগে নবম জাতীয় সংসদ (২০০৮) ও তৃতীয় উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে (২০০৯) প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের তথ্যের বিশ্লেষণ নিয়ে দুটি বই প্রকাশ করা হয়।

দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনটি একতরফা হলেও এতে অন্তর্ভুক্ত তথ্যগুলোর ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে। তথ্যগুলো ভবিষ্যতে গবেষকেরা কাজে লাগাতে পারবেন। অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরির জন্য তথ্যগুলো গণমাধ্যমেরও কাজে লাগবে। বাংলাদেশের নির্বাচন-প্রক্রিয়া তথা রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরা তথ্যগুলোকে রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহার করতে পারবেন। এছাড়া রাজনৈতিক দলগুলোও তাদের সম্ভাব্য প্রার্থীদের ডেটাবেজ তৈরিতে প্রকাশনাটির সহায়তা নিতে পারে। স্বার্থসংশ্লিষ্ট এসব ব্যক্তির প্রকাশনাটি কাজে লাগলেই সুজন-এর এই প্রচেষ্টাকে সফল বলে মনে করব।

বর্তমান প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত তথ্য সংগ্রহ, পাণ্ডুলিপি তৈরি এবং প্রতিবেদনটি প্রকাশের সাথে যুক্ত সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। তাদের এ মহৎ প্রচেষ্টা শতভাগ সফল হোক- এই কামনা করি।

ড. এটিএম শামসুল হুদা
সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার
৫ মে ২০১৯